International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-IV, February 2020, Page No. 16-22
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.16-22

অসীম রায়ের ট্রিলজি: একটি বিশ্লেষণী পাঠ

অশ্বিনী শর্মা
গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Asim Roy is one of the most well-aware novelists of India after freedom. Analysis of his novels, it is understood that he has usually made the appearance of contemporary times in literature. He has never entertained the readers with exiting and alluring stories. What he has seen, he has directly transformed into a novel. Asim Roy has written a total of seventeen's (17) novel including short and broad. Keeping in traditional art of Trilogy in Bengali literature, Ashim Roy makes his debut into the world of the Bengali novel. 'Ekaler Katha' is the first novel of his 'Nityagopal Trilogy', 'Gopaldeb' is the second and the third one is 'Kkada Train-e'. The journey of Nityagopal's life has begun from 'Ekaler katha' and ended in 'Ekada Train-e'. Asim Roy in his Trilogy has skillfully depicted the schooling, political struggle, romance with Nayan and the social adjustment of Nityagopal. In the main article everything of the above will be discussed in detail.

Key Words: Asim Roy, Trilogy, Intensive-Analysis.

অসীম রায় (১৯২৭-১৯৮৬) স্বাধীন-পরবর্তী কালের এক ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক। এই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের সঙ্গে বর্তমান সময়ের পাঠক খুব একটা পরিচিত নয়। তাঁর নামও হয়তো আজকের সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক শোনেনি। অথচ অসীম রায়ের উপন্যাসের জগতটি নানা কারণে ঐতিহাসিক বিচারে তাৎপর্যমণ্ডিত। অসীম রায় তাঁর সমগ্র জীবনে ছোট-বড় মিলিয়ে সতেরটি (১৭) উপন্যাস লিখেছেন। তিনি কখনোই সস্তা মনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্য লেখেননি। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে 'একালের কথা', 'গোপালদেব', 'দ্বিতীয় জন্ম', 'রক্তের হাওয়া', 'দেশদ্রোহী', 'শব্দের খাঁচায়', 'একদা ট্রেনে', 'আবহমানকাল' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'Trilogy'-র সংজ্ঞা প্রসঙ্গে 'Webster Dictionary'-তে বলা হয়েছে-- "A series of three dramas or literary works or sometimes three musical composition that are closely related and developed a single theme."[১] 'ট্রিলজি; শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় 'ত্রয়ী' শব্দটি গৃহীত হয়েছে। ত্রয়ী উপন্যাস বলতে বোঝায়, যদি কোন উপন্যাসের তিনটি পাঠ থাকে। সিরিজ লেখার ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ট্রিলজিতে কাহিনির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। আবার প্রতিটি গ্রন্থ পৃথক ভাবেও পাঠযোগ্য। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ জাতীয় 'ত্রয়ী' উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রথম সার্থক রূপকার। তাঁর এই 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহনা' চেতনাপ্রবাহ রীতিতে লেখা বাংলায় প্রথম উপন্যাসও বটে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'অপু' ট্রিলজি, 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'কাজল'। আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন

'সত্যবতী' ট্রিলজি, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা'। এই 'ট্রিলজি' শিল্পরূপটি পথ ধরেই বাংলা উপন্যাসে অসীম রায়ের আত্মপ্রকাশ। তাঁর 'নিত্যগোপাল' ট্রিলজির প্রথম উপন্যাস 'একালের কথা' (১৯৫৩), দ্বিতীয় উপন্যাস 'গোপালদেব' (১৯৫৫), তৃতীয় উপন্যাস 'একদা ট্রেনে' (১৯৭৬)। এই ট্রিলজি উপন্যাসের নায়ক নিত্যগোপালের পথ চলা শুরু হয়েছে 'একালের কথা'-য় এবং শেষ হয়েছে 'একদা ট্রেনে' এসে।

'একালের কথা' (১৯৫৩) উপন্যাসের মুখবন্ধে ঔপন্যাসিক অসীম রায় স্তাঁদালের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখের মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসের সারকথা ব্যক্ত করেছেন—

> *"আরে মশাই, একটা উপন্যাস হল গিয়ে একখানা আয়না যা রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলেছে কেউ। একটা সময় তা আপনার সামনে মেলে ধরবে সুনীল আকাশের প্রতিবিম্ব; আবার অন্য সময় ধরবে আপনার পায়ের নীচেই যত খানা-খন্দ-কাদা।"*[২]

লেখক এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই নিত্যগোপালের পথ চলার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। নিত্যগোপালের জবানীতে শুনিয়েছেন মধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা, তরুণ সমাজ এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি। একদিকে স্বপ্নের, রোমান্টিকতার, সাম্যবাদের উদার বিস্তৃত রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশ, অন্যদিকে মানুষের ধর্মান্ধতা, সীমাবদ্ধতা, সুবিধাবাদী মনোভাব যা কাদা খানা-খন্দে রূপায়িত হয়েছে এই উপন্যাসে। নীচতা, ক্ষুদ্রতা এবং স্বার্থপরতায় লিপ্ত মানুষগুলি আজও বহন করে চলেছে সেই বাস্তব সত্যকে। তাই 'একালের কথা' হয়ে উঠেছে চিরকালের কথা।

১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই মনুমেন্টের নীচে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির জমায়েতের বিবরণ এবং দুই বন্ধু নিত্যগোপাল ও হাশেমের নিবিড় সম্পর্কের বুনন দিয়ে উপন্যাসের শুরু। নিত্য ও হাশেম দুজনেই শ্রমিক নেতা এবং শ্রমিকদের বক্তব্যের মধ্যে আগামী দিনের স্বপ্নকে দেখতে পায়। তাদের বিশ্বাস এই ভুখা মানুষরাই একদিন 'তামাম হিন্দুস্থান'-কে হেলিয়ে দেবে। হাশেম বামপন্থী রাজনীতির সক্রিয় সদস্য এবং এই বামপন্থা, মিটিং-মিছিল, আন্দোলন সম্পর্কে রোমান্টিক। অন্যদিকে এই মিছিল, আন্দোলন, আইন-অমান্য কর্মসূচি মেনে নিতে পারে না নিত্য। দাঙ্গার অসারতা সম্পর্কে হাশেম বন্ধুদের বোঝায়। অথচ মানুষের শুভবুদ্ধির উপর আস্থাশীল এই হাশেমকে দাঙ্গার বলি হতে হয়। হাশেমের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবের কঠিন আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আর বন্ধুর মৃত্যু নিত্যকে বিহ্বল, অসার করে তোলে। এই ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যেই নিত্য বামপন্থী রাজনীতিতে যোগ দেন। তবে এই যোগদানের পেছনে তার সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল সুনীল সেন। এই ছাত্র নেতার কথাবার্তা নিত্যর সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। এর পরেই নিত্য অনেকটাই রোমান্টিক, আবেগতাড়িত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিলে যোগ দেয়। যদিও পুলিশের লাঠির আঘাতে এই আন্দোলন পচা কাপড়ের মতো ফরফর করে ছিঁড়ে যায়।

সময়টা ছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট। নেমে এলো কলকাতার বুকে দাঙ্গার মতো এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকা। যা ইতিহাসে "The Great Calcutta Killing" নামে পরিচিত। মানুষের কাছে মানুষের পরিচয় সেদিন কিছু বাহ্যিক চিহ্ন এবং ধর্মাচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দুই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কিছু মানুষের ফতোয়াই বৃহত্তর গোষ্ঠী, সমাজ মেনে নিল। পরাজিত হল মানুষের শুভবুদ্ধি। অশুভ শক্তির তাণ্ডবে সমস্ত কলকাতা সেদিন বেসামাল। হিন্দুকে মুসলমানের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেওয়া হল। ঔপন্যাসিক এই ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> *"ষোলই আগস্ট, উনিশশো ছেচল্লিশের রাতটা সহজে ভুলবে না কলকাতাবাসী। সমস্ত শহর জুড়ে এক ক্ষেপামির ঘূর্ণি তোলপাড় করেছিল শহরবাসীর মন, উল্টে-পাল্টে উপড়ে ফেলে দিয়েছিল মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে, আশা-আকাঙ্ক্ষার, ভালোবাসার উচ্ছেকে। খেঁতলে পিষে একাকার হয়ে গিয়েছিল সমস্ত চেতনা। মানুষকে সেদিন দেখা হয়েছিল মানুষ হিসেবে নয়, গায়ে ধুতি ঝুলছে না পাজামা রয়েছে,*

দাড়ি আছে কি নেই, এসব বাইরের মাপকাঠিতে। কলকাতাবাসীর অন্তত মনে থাকবে সেই বিভীষিকার লগ্ন। ...নেতারা সাড়া দিয়েছিলেন, হিন্দু নেতা মুসলমানের বিরুদ্ধে, মুসলমান নেতা হিন্দুর বিরুদ্ধে অগ্নিময়ী দিয়ে। তাই মরা স্বামীর মাথা কোলে রেখে বৌ ভেবেছিল এ কোন দেশে এলাম? আর মরা ছেলেকে বুকে আঁকড়ে মা ভাবলে এ কাদের দেশ?"[৩]

এই উপন্যাসে নিত্যগোপালের বিপরীত মেরুতে অবস্থান তার দাদা সত্যগোপালের। তার কাছে বিপ্লব, সাম্যবাদ অর্থহীন। তিনি বিলিতি কাগজের একজন নাম করা সাংবাদিক। নিত্যর রাজনীতিতে যোগদান, বিপ্লব, পুলিশের মার খাওয়া কোনটাই মেনে নিতে পারেন না তিনি। নিত্যর জীবন দর্শন তার কাছে অচেনা। তাই সত্যগোপাল সস্নেহে ঠাট্টা করে বলে—

"নিত্য ইউ আর ফানি। কী বললি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপন। বাব্বাঃ এত বড় কথাও বাংলায় বেরিয়েছে। তা তুই যদি সত্যিই সেই সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাস তবে চায়ের পার্টি দেনা, বন্ধু বান্ধবদের খাওয়া, একটা বেশ সলিড লোকের একটি মাত্র মেয়ে...।"[৪]

এই সত্যগোপালের মধ্য দিয়েই কথা বলে ওঠে সেদিনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ। নিত্য, হাশেম, হরেনের মতো এরা অবায়বীয় স্বপ্নের পেছনে ছুটতে রাজি নয়। সমাজ বিপ্লব, মিটিং-মিছিল এদের কাছে অর্থহীন উপন্যাসের নায়ক নিত্যগোপালের স্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধু হাশেম তাকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। এর ফলেই নিত্য বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে শ্রমিক সংগঠনের সদস্য হয়ে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেন এবং তাই কাজে নিজের মুক্তি খুঁজে পান। নিত্য চরিত্রের এই বিবর্তনকে সত্যগোপাল 'বৈচিত্র্য বিলাস' বলে অভিহিত করেছে। আসলে নিত্য এভাবেই বৃহত্তর মানুষের কাছাকাছি পৌঁছাতে চায়।

আলোচ্য উপন্যাসে চল্লিশের দশকের মধ্যবিত্ত বাঙালির দ্বিধাবিভক্তিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই সময় একদল তরুণ যুবক যখন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য, আদর্শের জন্য জীবনকে বাজি রেখে আন্দোলনে নেমেছে, ঠিক তখনই আর একদল যুবক নিজের আখের গোছাতে এবং বিলাস ব্যসনে ব্যস্ত থেকেছে। হাশেম, নিত্যগোপাল, সুনীল সেন, হরেনের মতো যুবকেরা প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি। এরা দেশের জন্য ভাবে, দেশের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে। শ্রমিকদের বাস্তব অবস্থা জানতে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক বস্তিতে পর্যন্ত যেতেও এরা পিছুপা হয় না। এইসব যুবকদের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্যদিকে বাবুন, বুড়ো, সাচু, সুবোধেরা দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি। এরা চৌরঙ্গীর রেস্তোরাঁয় সান্ধ্য মজলিশকে জমজমাট করে তোলে শুধু তাই নয় এদের মধ্যে অনেকেই নিজের আখের গোছাতে অন্যের উমেদারি করে চাকরি পর্যন্ত হাতিয়ে নেয়।

সুবোধ নিত্যগোপালের বোন হাসিকে ভালোবেসে বিয়ে করে। কিন্তু বিয়ের পর হাসির অস্তিত্ব সুবোধ ভুলে যায়। দৈনন্দিন সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণা তাদের রোমান্টিক প্রেমকে ভোঁতা করে দেয়। সুবোধ দাবার ঘুঁটিতে ও ক্রশওয়ার্ড পাজলে আশ্রয় খোঁজে এবং হাসি ছেলের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়। আধুনিক সমাজ ও সময়ের প্রেমহীনতাকে লেখক হাসি-সুবোধ এবং সত্যগোপাল-জ্যোস্নার দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন। সত্যগোপাল ইংরেজি কাগজের সফল সাংবাদিক। এই ইংরেজি কাগজের পেছনে ছুটতে ছুটতে তিনি জ্যোস্নার কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন। এই সময় বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে নিয়তির ভূমিকা নিয়েছিল অর্থ। অর্থাৎ টাকা-পয়সা, যশ-খ্যাতির পেছনে ছুটতে গিয়ে বাঙালির সংসার ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে ভাঙন দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও অবনমন লক্ষ করা যায়। আসলে আর্থিক স্বচ্ছলতা যে মধ্যবিত্তের সুখ কেড়ে নিচ্ছে এবং সম্পর্কের ভাঙন ঘটাচ্ছে তা এই দুটি দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বহুমাত্রিকরূপে উন্মোচিত। আবার সেই সময়ের উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বন্দনা পাল বলেছেন—

> *"একালের কথা-য় সেই সময়ের কলকাতার উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের এক নিপুণ ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এখান রিটায়ার্ড জর্জ দীনেশ মুখার্জির মতো দাম্ভিক, আত্মগর্বী, অহংকারী, সুবিধাবাদী মানুষকে দেখি অবিনাশবাবুর মতো সৌখিন সংস্কৃতিসেবীর দেখা পাই, যুদ্ধের দৌলতে ফুলে ফেঁপে ওঠা সদানন্দবাবুত মতো লোকও বহু রয়েছে এ সমাজে। আবার সুধাংশুবাবুর মতো নির্বিরোধ ভালো মানুষেরা এখানে কোণঠাসা।"*[৫]

'একালের কথা' উপন্যাসটি শেষ হয়েছে সময়ের প্রবাহে বিবর্তিত মানুষের পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে। চরিত্রেরা প্রত্যেককে নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু কালের করাল থাবা তাদের প্রত্যেককে স্পর্শ করেছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিত্যগোপাল সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও বামপন্থায় আকৃষ্ট হয় এবং অনির্দিষ্ট যাত্রাপথে পাড়ি দেয়। নিত্যগোপাল বুঝতে পারে ময়দানের মিটিঙে, মাইকের সামনে, মাথা হেলিয়ে, আকাশে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ধরে "তামাম হিন্দুস্থানকো হিলা দেঙ্গে" বলা অনেক সহজ, কিন্তু কঠিনতম কাজ হচ্ছে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তকে তার জন্য তৈরী ও সংঘবদ্ধ করা। তবুও নিজের সংকল্প থেকে সরে দাঁড়াতে নারাজ নিত্যগোপাল। এভাবেই নিত্যগোপাল খোঁজে রাজনীতির আসল অর্থ, খোঁজে বেঁচে থাকার মানে। তাই 'একালের কথা' শুধু একালের কথা নয়, যেন চিরকালের কথা হয়ে উঠেছে।

অসীম রায়ের ট্রিলজির দ্বিতীয় তথা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোপালদেব' (১৯৫৫)। এই উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৫০ সাল। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুবসমাজের চাওয়া-পাওয়া এবং কিছু হতে না পারার পরিণামী ব্যর্থতাবোধের সার্থক সৃষ্টি 'গোপালদেব'। 'একালের কথা' উপন্যাসের নায়ক নিত্যগোপালের অন্তর্জগতের কথাই এই উপন্যাসের মূল বিষয়। এম. এ. পাশ করার পর মিস্টার জাস্টিস বসুর চেষ্টায় দাদার অফিসেই গোপালের কর্মজীবন শুরু হয়। উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় গোপালদেব মি. বসুর বাড়িতে প্রতীক্ষারত। সাক্ষাৎপ্রার্থী গোপাল স্লিপে নাম লেখে নিত্যগোপাল চৌধুরী। পরে অবশ্য নামের প্রথম ও শেষ অংশ কেটে বাদ দেয় এবং গোপালের সঙ্গে এতদিনকার বংশগত উপাধি 'দেব' জুড়ে দিয়ে নিজেই নতুন নামকরণ করে 'গোপালদেব'। উপন্যাসে নায়কের এই স্বনাম পরিবর্তন তাই অনেকটাই সঙ্কেতবহ।

'একালের কথা'র নিত্যগোপাল এই উপন্যাসে অনেক বেশি পরিণত। 'গোপালদেব' উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় গোপাল ও নয়নের প্রেম। 'একালের কথা' উপন্যাসের 'পুষ্প' এখানে 'নয়ন' হয়ে দেখা দিয়েছে। নয়নের পরিচয় সে গোপালের বন্ধুরা মা, তার মাসি। গোপাল ও নয়নের এই সমাজবিরুদ্ধ প্রেমকে চিত্রায়িত করে অসীম রায় অনেকটাই সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রেমে তথাকথিত যে বৈধ রূপ আমরা দেখতে পাই 'গোপালদেব'-এ এসে তার ব্যত্যয় ঘটে। লেখক এখানে প্রেমের নতুন রূপ কে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এই প্রেমকাহিনি রচনায় অসীম রায় স্তাঁদালের দ্বারা অনেকটাই অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অসীম রায় তাঁর আত্মজীবনী 'জীবন মৃত্যু'-তে মন্তব্য করেছেন—

> *"এই ফরাসি লেখকের প্রেম সম্পর্কে যে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি তা তাকে বিশেষ ভাবে টানে। নায়ক যেন লড়াই করে প্রেমিকাকে জয় করছে আর এই লড়াইয়ে ধন-সম্পত্তি স্ট্যাটাস কিছুই বিশেষ আসে যায় না। তারুণ্যের দীপ্তির সঙ্গে মিশে থাকে মানবিক ঔজ্জ্বল্য যা সমস্ত বাধা দমিয়ে ফেলে এবং নারী সহর্ষে তার আনন্দের খনি উন্মোচিতকরে দেয় তার সামনে।"*[৬]

আলোচ্য উপন্যাসে নায়ক গোপালদেবের দ্বৈত জীবনসত্তা বর্ণিত হয়েছে। একদিকে সে যেমন একটি নামকরা ইংরেজি কাগজের সাংবাদিক, অন্যদিকে সে আবার নয়নের প্রেমিক। নয়ন চরিত্রটি এই উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। নয়ন ভাগ্যবিড়ম্বিত চরিত্র। বারে বারে তার সুখের নীড় ভেঙে গেছে। বিয়ের দুবছরের মধ্যেই স্বামীর প্রেম থেকে বঞ্চিত হতে হয় তাকে। নয়ন দুই ছেলে অন্তু-মান্তাকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সে স্বপ্নও

ব্যর্থ হয়ে যায়। তবে কোন কিছুতেই হেরে যাবার পাত্রী নয় নয়ন। পণ্ডিচেরির এক আশ্রমে কিছুদিন থাকার পর কলকাতায় দিদির বাসায় রাঁধুনীর কাজ করে জীবন-যাপন করতে হয় তাকে। তাই নয়নের এই অনমনীয় চরিত্রকে গোপাল শ্রদ্ধা করে, ভালো বাসে। লেখক গোপাল-নয়নের প্রেমকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোন রকম রহস্যময়তার আশ্রয় নেয়নি। নয়নের কাছে গোপাল শুধুই একজন প্রেমিক নয়, যেন ভগবান। তবে মাঝে মাঝে এই প্রেম নিয়ে গোপালের কাছে নয়নের প্রেম মহার্ঘ। যে কোন মূল্যেই এই প্রেমকে সে বাঁচিয়ে রাখবে। 'গোপালদেব' উপন্যাসের নয়ন চরিত্র সম্পর্কে বিষ্ণু দে মন্তব্য করেছেন-

> *"গোপালদেবের তীব্রতার রেশ মেনে নিয়েও ভাবছি কেন সহস্রবাহু জীবন গোপালদেবকে, আমাদেরও এড়িয়ে যায়, রেখে যায় শুধু নয়নের মতো আশ্চর্য একজোড়া মাত্র বাহু, যে নয়ন নায়কের কাছে দামিনীর মতো আশ্চর্য প্রাণশক্তির এক করুণ ব্যক্তিস্বরূপ?... রোহিনীতে যে আড়ষ্ট আরম্ভ সেই বিনোদিনীরাই তো দামিনীর মধ্যে নিটোল প্রাণায়তা পায়, সোহিনীতে তারই ভাঙন ধরে, তাকেই দেখি শরৎচন্দ্রের কমললতায়, বিভূতিভূষণের দৃষ্টিপ্রদীপে।"*[৭]

গোপালদেব চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সে একই সঙ্গে দুই জগতের বাসিন্দা। তার সত্তা দ্বিধা বিভক্ত। একটি তার বহির্জগৎ, অন্যটি অন্তর্জগৎ। এই অন্তর্জগতকে গোপাল 'সৌরজগৎ' বলে অভিহিত করেছে। গোপাল তার বন্ধুবর্গ বাবুন, বুড়ো, সাচু অমিয় দত্ত, সুবোধ, সুপ্রিয়দের সঙ্গে একাত্মবোধ করে না। গোপাল তার 'সৌরজগৎ' নয়নের প্রেম নিয়ে রোমান্টিক, চিন্তাশীল। প্রেমের বাস্তব জগৎ ছেড়ে সে মানসলোকে যাত্রা করেছে। ধূলিধূসর কলকাতা মহানগর তার কাছে অবাঞ্ছিত মনে হয়েছে। সেদিক থেকে নয়ন অনেক বেশি বাস্তবিক। গোপাল শৈশবেই মাতৃহীন হয়। পরে তার স্নেহের ও প্রেমের স্থান পূর্ণ করে নয়ন। অন্যদিকে গোপালের সংস্পর্শে এসে নয়নও তার হারানো স্বপ্নকে নতুন করে দেখে। গোপাল এই নারীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলেও নয়নের অসম্মতিতে তা সফল হয় না। নয়ন এ বিষয়ে অবগত যে গোপাল তার জীবনে ক্ষণকালের আভাস মাত্র। তাকে তার জীবনে ধরে রাখলে গোপাল তার নিজস্ব জগৎ থেকে বিচ্যুত হবে। তাই গোপাল চরিত্রকে সম্ভাবনাময় করে তোলার জন্য সে তার জীবন থেকে বিদায় নেয়।

উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, গোপাল তার সংবাদপত্রের অফিস ছেড়ে দিয়ে সামান্য স্কুল শিক্ষকের জীবন বেছে নেয়। অন্যদিকে নয়নও আত্মীয়-স্বজন, আশ্রম ছেড়ে দিয়ে যোগ দেয় উদ্বাস্তু স্কুলের গানের শিক্ষিকা হিসেবে। নয়নের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত দাগ রেখে গিয়েছে তার জীবনে। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের যে ছবি তাকে অহরহ পীড়া দিত সে ছবি তার মন থেকে মুছে যায়নি। কিন্তু নয়নের সাহচর্যে এসে সে এই সমাজেই নিশ্বাস নিতে শিখেছে।

অসীম রায়ের ট্রিলজির শেষ তথা তৃতীয় উপন্যাস 'একদা ট্রেনে' (১৯৭৬)। এই উপন্যাসের ভূমিকায় 'লেখকের নিবেদন' অংশে অসীম রায় নিত্যগোপাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> *"...সে এখন কিছুটা হেরে কিছুটা জিতে এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে দেখে একদিকে যেমন নয়ন, তেমনি আছে সাকসেসফুল অমীয়। এ ট্রিলজির নায়ক শেষ পর্যন্ত বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন হয়েও প্রত্যাঘাত করে না। সে দেখে আশে পাশে হাসি-সুবোধের দাম্পত্য জীবনের মতো প্রবল বৈসাদৃশ্যে ভরা এ ভুবন। জোর করে যেমন ঋতু পরিবর্তন ঘটানো যায় না, তেমনি জোর করে মানুষ পালটানো যায় না। কোনো কিছুর ঝটপট সমাধান সে করতে নারাজ। সকলের পাশে একটা সাধারণ অথচ একান্ত স্থান খুঁজে সে নিতে চায়।"*[৮]

আলোচ্য উপন্যাসে নিত্যগোপালের পাশাপাশি হাসি-সুবোধের দাম্পত্য জীবনও প্রাধান্য পেয়েছে। দৈনন্দিন মনোমালিন্য তাদের দাম্পত্য জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। আধুনিক দাম্পত্য জীবনের প্রেমহীনতার এক নতুন রূপ

হাসি-সুবোধের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন লেখক। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, নিঃসঙ্গতা তাদের এক ধূসর জগতে এনে দাঁড় করিয়েছে। যেখানে গ্রীষ্মের দাবদাহ আছে, কিন্তু বর্ষার স্নিগ্ধতা নেই। সুবোধের ঔদাসিন্য ও প্রেমহীনতা হাসি মেনে নিতে পারে না। আর এখান থেকেই তাদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তির সূত্রপাত। পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে তাদের দশ বছরের বিবাহিত জীবন ঊষর মরু মাত্র। হাসি প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, দুঃখকে দাম্পত্য প্রেমের মধ্য দিয়ে জয় করতে চেয়েছে। কিন্তু সুবোধের স্ত্রী হয়েও তার চিন্তা ও কর্মের সঙ্গী হতে পারেনি কখনো। হাসি অভিযোগ করে সুবোধ তাকে কখনো স্ত্রীর যোগ্য মর্যাদা দেয়নি। দাদা সত্যগোপালের কাছে নিজের অব্যক্ত বেদনাকে প্রকাশ করে হাসি বলে, "আমার যে কিছু করার আছে, আমি যে কিছু করতে পারি সেটাই সে মানে না। ...সময় সময় সুবোধের ওপর এমন উপদ্রব করি যে আগে কখনো করতাম না। আমি যা নই তাই হতে চাই।"[৯]

হাসি-সুবোধের দাম্পত্য কলহে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের মেয়ে টাবু। টাবুর বড় হয়ে ওঠার জন্য তার বাবা-মা উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারেনি। আর এই গৃহ পরিবেশ টাবুর দুরন্ত, চঞ্চল, মধুর শৈশব কেড়ে নিয়েছে। হাসি-সুবোধ তাদের দাম্পত্য বিরোধ এড়িয়ে চলতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। প্রতিবারই সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে। সুবোধ তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক, সংসার জীবন নিয়ে অনেক ভেবেছে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। এটাই আধুনিক দম্পতির ভবিতব্য। হাসি-সুবোধের পাশাপাশি দীলিপ খুশির দাম্পত্য জীবনকে অনেক বেশি বর্ণময় করে এঁকেছেন লেখক। খুশি যেখানে সব কিছুকে সহজেই মেনে নিয়েছে, সেখানে হাসি অভিযোগ করেছে।

নিত্যগোপাল এই উপন্যাসে আবার স্বনামে ফিরে এসেছে। 'একালের কথা', 'গোপালদেব' দুটি উপন্যাসে দেখা যায় নিত্যগোপাল অনেকটাই সিরিয়াস এবং অসামাজিক। কিন্তু 'একদা ট্রেনে' উপন্যাসে নিত্যগোপাল সামাজিক। এখানে নিত্যগোপাল কিছুটা অতীতচারী। নয়নের ভালোবাসা এখন তার কাছে স্মৃতিমাত্র। মাঝে মাঝে তার কথা মনে পড়ে, ছোটবেলার স্মৃতি ভেসে ওঠে মনের পর্দায়। পূর্বের দুটি উপন্যাসের তুলনায় নিত্যগোপাল অভিজ্ঞতায়, বাস্তবতায় অনেক বেশি পরিণত এবং প্রাজ্ঞ। জীবনের মধ্যে থেকেই জীবনকে দেখেছে সে। এককথায় নিজস্বতা বিসর্জন দিয়ে পেশাদারিত্ব অর্জন করে নিত্যগোপাল।

'একদা ট্রেনে' উপন্যাসের কাহিনি শেষ হয়েছে একদা একটি ট্রেন যাত্রার মাধ্যমে। এই ট্রেন যাত্রার পরিকল্পনা করে খুশি ও দীলিপ এবং সঙ্গী হয় হাসি-সুবোধ, অমিয়-অমলা, নিত্যগোপাল, সুপ্রিয়, বাবুন, সাচু, আনন্দ সকলেই। এই ট্রেন যাত্রার মাধ্যমে হাসি আবার স্বাভাবিকত্ব ফিরে পায়। হাসি গান গায় আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে। আর এই গান তার এতকালের ঝগড়া-ক্লান্ত জীবনকে বদলে দেয়। ট্রেন ডোমজুড় ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যগোপাল দেখতে পায় নতুন বর্ষার সমাগম, মেঘলা আকাশ, চাষীদের কর্মব্যস্ততা, জলে জোয়ান-বুড়ো-শিশুদের মাছ ধরার ধুম। ট্রেন যাত্রার আনন্দ, মজা শুধু ছোট্ট টাবুর কাছেই অর্থবহ। কারণ সে একটা গোটা দিন বাবা-মায়ের ঝগড়ার সম্মুখীন হয়নি। তার শৈশব মায়াবী আকাশ, রিমঝিম বৃষ্টি, ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, নদী বহুজন সম্মিলনের কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে। এই ট্রেন যাত্রার শেষ হয়—

> *"স্টেশন এসে গেল। সবাই আলাদা আলাদা ছাড়া হয়ে যায়। স্টেশনের বড় আলোটা নিভে গেছে। এক ঝাঁক তারার আলোর নীচে তারা অপেক্ষা করতে থাকে। টাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, মা মা আজকের দিনটা আমাদের সবচেয়ে মজার দিন।"*[১০]

পরিশেষে বলা যায়, অসীম রায়ের 'নিত্যগোপাল' ট্রিলজি বহু চরিত্র ও ঘটনার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এই গড়ে ওঠা কাহিনির সময়কাল প্রায় বিশ বছর। অসীম রায় তাঁর ট্রিলজির প্রথম উপন্যাস 'একালের কথা' শুরু করেছিলেন ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায়। দাঙ্গার সেই বীভৎস রূপ কে তিনি 'একালের কথা' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। ট্রিলজির দ্বিতীয় উপন্যাস 'গোপালদেব'-এ নায়ক নিত্যগোপাল ওরফে গোপালদেবের অন্তর্জগতের

কাহিনিই প্রাধান্য পেয়েছে। শেষ উপন্যাস 'একদা ট্রেনে'-তে নিত্যগোপাল স্বনামে ফিরে এসে জীবনের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে আপোস করে সকলের মাঝখানে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

সূত্রনির্দেশ:

১) www.merriam-webster.com
২) রায়, অসীম, "উপন্যাস সমগ্র" ১ম খণ্ড, এবং মুশায়েরা, ১ম প্রকাশ জানুয়ারী, ২০১০, কলকাতা, পৃ- ০২।
৩) তদেব, পৃ- ৩৪।
৪) তদেব, পৃ- ৫৭।
৫) পাল, বন্দনা, "অসীম রায়ঃ জীবন ও শিল্প", বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০১৫, কলকাতা, পৃ- ৪৭।
৬) রায়, অসীম, "জীবন-মৃত্য", প্রতিক্ষণ, ১ম প্রকাশ, মার্চ, ১৯৮৭, পৃ- ৩৬।
৭) মল্লিক, কৃষ্ণগোপাল (সম্পাঃ), "অসীম রায় সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ", অধুনা, ১৯৭৭, কলকাতা, পৃ- ৩১।
৮) রায়, অসীম, "উপন্যাস সমগ্র" ৩য় খণ্ড, এবং মুশায়েরা, ১ম প্রকাশ জানুয়ারী, ২০১০, কলকাতা, পৃ- ৯১।
৯) তদেব, পৃ- ১০৬।
১০) তদেব, পৃ- ১৮৫।